Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 30-36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি': লোক-ঐতিহ্যের সংকট

ড. অমিত দে
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়, পুরলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

India is a feudalistically oriented agricultural country. Even the Indian cities can be seen as virtual expansions of villages. So the real culture of India is embodied in her villages. There are embedded in the cultural palimpsests of the Indian villages' millennia old myths, legends and various narratives of secret traditions. In Bhagirath Mishra's novel 'Arkathi' is narrativized the spectrum of the popular life of Basu-sabar community in Gazasimul village of Bankura as well as the crisis of the old age popular traditions. The gross barbarism of the middle ages has ended but the oppression of the powerless by the powerful is perennial, only the forms of oppression changing with time. The hypocritical people masquerading as magnanimous ones are exploting the poor. The writer while discussing the popular life of the Basu-sabar community has exposed the tradery in "folk-culture" who pretend to be sympathetic to popular culture. The foreigner Kethi Bird and professor Rajib, in the same way, manipulate the cultural life of the Basu-sabar community for the sake of monetary profit & fame. Rajib is maddened by the luxery foreign trips, seminar, economic affluence and a life of comfort. Rajib, who had once set up an organization politically radicalized folk-culture in order to save the Basu-sabar community from the exploitations of Ranglal, ends up turning that organization into another explotative trap for those poor people. The rural people are duped/deceived, Rangi turns into a prostitute. The consumer culture, in this way, gormandizes/swallows up the popular traditions of rural areas.

Keywords: Popular tradition, crisis, explotative trap, rural tragedy, tradery in folk-culture.

ভারতবর্ষ এক বিরাট সামন্ততান্ত্রিক দেশ। নৃতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও উদ্ভিদবিদ্যাবিদেরা আজ একমত যে আর্যেরা এদেশে আসার আগেই এদেশে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রে জানা গেছে যে, অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ত্রালরাই এই দেশে সভ্যতার বীজ রোপণ করেছিল :

"অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষিকার্য ও তদ্‌বলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে"[১]

আর্যরা এদেশে আসার পরে কৃষিসভ্যতায় আরো গতিশীলতা এসেছিল। তবে বর্তমান আধুনিকতার যুগেও এই সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক দেশটিতে রয়েছে হাজারো সমস্যা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যার বিপুলতা ইত্যাদি হরেক

কিসিমের সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশ। এখানে মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জন্য মারাত্মক সংগ্রাম করে। নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে পাহাড়-ডুংরি-জঙ্গল ঘেরা গ্রামগুলিতে অন্ত্যজ মানুষের হাহাকার ছিল সর্বব্যাপী। গাছ-গাছালি, অফুরন্ত ফলমুল, জমি-জায়গা ইত্যাদি সমস্তকিছু হাতের কাছে থাকলেও তাতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। জমিদার বা জোতদাররাই ছিলেন সেসবের মালিক। জমিদারদের বেগার খাটা তাদের ধর্ম হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদের ফলে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলির কিছুটা সুরাহা হলেও তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেল। অত্যাচারের রূপরেখা বদলাল। শোষণের স্থূলতা কমে গেল। আস্তে আস্তে গা-জোরের বদলে বুদ্ধির ঘরে ধোঁয়া দিয়ে, ভালোবাসার সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে অন্যভাবে শোষণ করতে শুরু করল একদল স্বার্থপর ধান্দাবাজ মানুষ।

সামন্তপ্রভুদের চাবুকের বাড়ির চাইতেও এ আঘাত অসহনীয়। সামনে মিষ্টি হাসি দিয়ে পেছনে ছুরিকাঘাত করা নিতান্তই গর্হিত অপরাধ। এতে আস্থা নষ্ট হয়, বিশ্বাসটাও আর থাকে না। ভারতবর্ষ রাজা-রাজড়াদের দেশ। এদেশে এটাই প্রচলিত রয়েছে যে, রাজা-মহারাজা দেশের ভগবান। তিনি গরীব প্রজার পিঠে দুটো চাবুক মারবেন কিম্বা যুবক কৃষকের সুন্দরী বউটাকে জমিদারবাবু একটু 'আদর' করবেন তাতে আর নতুন কিছু কি! অশিক্ষিত প্রজারা তাতে কিছু মনে করত না। মনে হলেও সেগুলো গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। সামন্তপ্রভুর অত্যাচারের নমুনা ইতিহাসে ভুরি ভুরি রয়েছে। এ নিয়ে অনেক উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচিত হয়েছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ'তে বঙ্কিমচন্দ্র সরব হয়েছেন, অক্ষয় কুমার দত্ত গরীব প্রজাদের হিতার্থে 'বঙ্গদেশীয় কৃষকদের দূরাবস্থা বর্ণন' নামক প্রবন্ধ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ গর্জে উঠেছেন, বিবেকানন্দ 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধে এদের দুঃখ-দুর্দশার জীবন্ত চিত্র অঙ্কণ করেছেন। আধুনিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', 'টোপ' ইত্যাদি গল্পে ছবির মতো উঠে এসেছে রাজার নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। ভগীরথ মিশ্রের 'তস্কর', 'মৃগয়া', 'জানগুরু' ইত্যাদি উপন্যাসে জমিদার-প্রজা সম্পর্কের নানান কাহিনী উঠে এসেছে। সুতরাং, ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী রাজা ও বিপরীতে দরিদ্র প্রজার কাহিনী কি ইতিহাসে, কি উপন্যাসে নতুন কিছু নয়। তবে 'আড়কাঠি' উপন্যাসে সে সমস্তকে ছাড়িয়ে এমন এক অজানা কাহিনীকে লেখক তুলে ধরেছেন তা একাধারে বাস্তবনিষ্ঠ ও অন্যদিকে উপজাতিদের অন্য সংকটের নতুন কথা বর্ণিত হয়েছে।

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করত। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে সদাগরদের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা রয়েছে। হিংগুল, মৃগনাভি, চর্ম, ঘৃত, কর্পূর ইত্যাদি বোঝাই করে প্রাচীন ভারতের ব্যবসায়িরা পণ্যশকটে করে বহু দূর দূরান্তে পাড়ি জমাত। সে বাণিজ্য যাত্রায় রোমাঞ্চ ও কৌতুহল দুটোই ছিল। এর পাশাপাশি ছিল বারাঙ্গনা ও শূদ্রদের নিয়ে ব্যবসা। পতিতাবৃত্তি পৃথিবীর বহু প্রাচীন ব্যবসা। অভিজাত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চোখের বিষ শূদ্রদেরকে দাস হিসাবে বিক্রী করা হোত। ভারতের প্রাচীন শহর কাশীর ঘাটে একসময় দাস কেনাবেচা চলত।[২] শূদ্রদের উপর নিপীড়ন, অকথ্য অত্যাচারের অসংখ্য নমুনা ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, ছোট রাজা-বড় রাজা, ভুস্বামি-জমিদার, বিজাতীয় আফগান-পাঠান-মোগলেরা এদেশের নিম্নবর্গ কৃষককুলকে ব্যাপক অত্যাচার করেছে। অষ্টাদশ শতকের গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এ বাংলায় বর্গী আক্রমণের ঘোর অনাচার ফুটে উঠেছে এইভাবে –

"চাসা কৈবর্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন বল্‌দের পিঠে লাঙ্গল লইয়া।

... ...
গর্ভবতী নারী জত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে"।[৩]

ধীরে ধীরে সময়ের বদল ঘটেছে। রাজতন্ত্র ক্রমশ ক্ষয়ীভূত হয়েছে। এখন তো প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবুও মানুষের উপর অত্যাচার এক ফোঁটাও কমেনি। শুধু অত্যাচারের রূপ বদল হয়েছে মাত্র।

বাঁকুড়ার গজাশিমূল গ্রামের বসু-শবরদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র একটি সমগ্র জাতির অস্তিত্বের সংকটটিকে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের নাম 'আড়কাঠি'। ব্যঞ্জনার্থে এই নাম প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় বাঁকুড়ার গজাশিমূল গ্রামের মানুষজন ও তাদের সংস্কৃতি। মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রধান দুটি কাহিনী রয়েছে। প্রথমত:, দাস-ব্যবসায়ী রংলাল এদের সর্বনাশ করেছে, দ্বিতীয়ত:, লোকসংস্কৃতি-প্রেমী প্রফেসর রাজীব এদের শেষ সর্বনাশটুকু করে দিয়েছে। এই দুটি কাহিনীর মূলে রয়েছে গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবরদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সরল মানসিকতা। এরা অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত। পাহাড়ে-ডুংরীতে, অরণ্যে শিকার করে বেড়ায়। সভ্য বাবুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে। সাক্ষাৎ হলেও জঙ্গলে লুকিয়ে বাঁচে। বংশপরম্পরায় পড়াশুনা কেউ করেনি। জীবনে দারিদ্র্য রয়েছে, জটিলতা নেই, থাকার কথাও নয়। নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা জীবনগুলি যখন খুশি খেলে বেড়ায়, দৌড়ে বেড়ায়। একান্নবর্তী বোধ সম্পন্ন মানুষগুলি একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। দুঃখে যেমন সকলে কাঁদে তেমনি সুখের সময় হাড়িয়া খেয়ে একসাথে ধমসা-মাদল বাজায়। এদের খাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে আছে অসংখ্য ফোক, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের অনেক নিদর্শন এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি লাগানো ঘরগুলিতে মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে নেকড়ে কিম্বা হায়না এসে বসু-শবর, শবর, লোধা, সাঁওতালদের দু একটি বাচ্চা ও ছাগল-গোরু তুলে নিয়ে যেত এমন ঘটনা তাদের জীবনে নতুন কিছু নয়। পশুদের হিংস্রতাকে এরা ভয় পায় না। কারণ পশুরা কেবল তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করতে পারে, ঘরে এসে আলাপ করে তার সঙ্গে সখ্যতা করে গৃহকর্তার ঘাড় মটকায় না। এখানেই মানুষের সঙ্গে তাদের তফাৎ। আধুনিক জটিলতা সর্বস্ব মানুষগুলির আদব-কায়দার কাছে তারা পরাস্ত হয়েছে। একের পর এক 'আড়কাঠি'তে আটকে গেছে। গ্রামীণ সরল জীবনে নেমে এসেছে কুল হারানোর বেদনা।

উপন্যাসে রঙলাল একজন কুখ্যাত দাস-ব্যবসায়ী। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অন্ত্যজ অসহায় মানুষগুলিকে একটু পয়সা ও ভালো থাকার কথায় ভুলিয়ে চালান করে দেয় বিহার, আসাম মুলুকে। এটাই তার পেশা। জোর করে লাঠিপেটা করে গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার দিন শেষ। তাই সে নতুন পদ্ধতি আমদানি করেছে, বুদ্ধি প্রয়োগ করেছে। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছে। গজাশিমুল গ্রামে ঢুকে সেই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের বিশ্বস্ততা আদায় করেছে। তাদের বাড়িতে মুড়ি, চিড়ে খেয়েছে, তাদের উঠোনে বসেছে, মুরুব্বির সঙ্গে খোশ গল্প করেছে, প্রয়োজনে মদ খাইয়েছে নিজের পয়সায়। উপন্যাসে তাঁর বিশ্বস্ততা আদায়ের চিত্রটি এরকম:

> *"বিহারের আরা জেলার কোথায় যেন রঙলালের বাড়ি। একদিন তালাশ্ করে গজাশিমুল গাঁয়ে ঢুকেছিল। ঠুকেই পাইকারি হারে বিলাতি আর পয়সা বিলোতে লাগল। দু'তিন দিন রইল গাঁয়ে। জঙ্গলে সেঁধিয়েছিল যারা, তারা একে একে বিলাতির গন্ধে ফিরে এল। মদ খেল, পয়সা নিল, চাল-আটা কিনল, মতিহার কিনল, শিকার মারল, ভোজ হল। দিন তিনেক বাদে একদিন সবাইকে দুখ্ দিয়ে চলে গেল রঙলাল"।*[৪]

আগেকার দিনে জমিদার বাড়িতে দাদন খাতার চল ছিল। লাল রঙের দাদন খাতাটি দেখলেই গরীব মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। চাবুকের চেয়েও বড় অস্ত্র ছিল দাদন খাতা। দাদন খাতাকে ব্যবহার করে জমিদারবাবুটি দরিদ্র প্রজার শেষ ভূমিটুকুও কেড়ে নিত কিম্বা বকেয়া হিসাব দেখিয়ে কাউকে বংশপরম্পরায় চিরদাস করে রাখত। রঙলালও অসময়ে দাদন দিয়ে এদেরকে আইনের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করত। সোজা কথায় কাজ না হলে রঙলাল দাদনের ভয় দেখাত। রুক্ষ রাঢ় এলাকা এমনিতেই বন্ধ্যা। বৃষ্টির উপর ভরসা করে থাকতে হয় এখানকার চাষীদেরকে। প্রান্তিক চাষীরা তো ফসল পেত না, জমিদারের লোকেরা এসে তুলে নিয়ে যেত। বসু-শবরদের মতো লোকেরা চাষ-বাস করত না। তাদের মূল ভরসা ছিল জঙ্গলের ফল-মুল এবং শিকার ধরা। দিনের পর দিন জঙ্গলের পরিস্থিতিও খারাপ হচ্ছে। সর্বগ্রাসী মানুষ জঙ্গলের দিকেও হাত বাড়াচ্ছে। জঙ্গল কেটে মানুষ বসতি গড়ে তুলছে, চোরাকারবারিরা জঙ্গলের কাঠ, ফলমুল সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। বনের পশু ক্রমশ কমছে, অরণ্যজীবী মানুষেরা

ঘোরতর খাদ্য সংকটে পড়েছে। এমতাবস্থায় রাঢ়ের খরা পরিস্থিতিতে গরীব মানুষগুলির নাভিশ্বাস ওঠে। উপন্যাসে এমন পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে এইভাবে:

> *"এই রুখা-ভুখা মাটির দেশে কাজ কাম নেই। ক্ষেত-জমিনের বারো আনাই টাঁড়-টিকর, ভাঙা। দো-ফসলা তো দূরের কথা, এ ফসলাও সব বছর হয়না। এক, আকাশ পাললে হয়, লচেত লয়। কাজ-কাম নেই বটে, তবে রাঢ়ের মানুষের সংখ্যাটা কম নয়। গরীব মানুষ দিনভর খাটালির পর এক-মুখীন আনন্দে ডুবতে গিয়ে, মানুষের সংখ্যাটা অজান্তে বাড়িয়ে ফেলে। আর এই রাঢ়ভূম আর জঙ্গলমহলে গরীব মানুষ – ভূমিহীন ভিটাহীন – এদের সংখ্যাই বারো আনা। এখানে কাজ কম, লোক বেশি। কাজ বিহনে, খাদ্য বিহনে রাঢ়ের এই বারো আনা মানুষ তিনমাসের বেশি পেটপুরে খেতে পায় না। বাকি ন'মাস তাদের চলে অর্ধাহার, অনাহার, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ, এবং রোগের প্রকোপে পড়ে মরণ"।*[৫]

এমন দুর্দিন পরিস্থিতিকেই কাজে লাগিয়েছে রঙলাল। সামান্য সুখের লোভে বসু-শবরদের তরুণ-তরুণিরা আসাম মুলুকে গিয়ে কুলি-কামিনের কাজ করেছে। আসল চিত্রটা আলাদা। দাস-ব্যবসায়ী রঙলাল এই সমস্ত অন্ত্যজ মানুষদের চালান করার বিনিময়ে পয়সা রোজকার করে। সে একটা মানুষ ধরার জাঁতাকল। গরীব মানুষগুলির কাছে একটি কল্পনার জগত তৈরি করে তাদের ভিরমি খাওয়ায় এবং দাদনের ফাঁসে ফেলে তাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। একবার সে মুলুকে গেলে কেউ ফিরে আসে না। অকথ্য অত্যাচারের শিকার হয়েছে তারা। প্রফেসর রাজীব ও সুচাঁদ ভক্তার আসাম ফেরত আসার সূত্র ধরে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সেসমস্ত কথা :

> *"সুচাঁদ শান্ত গলায় বর্ণনা করে যায় তার আসাম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। বর্ণনা করে ঝড়েশ্বর কোটালের বড় মেয়ে সাবিত্রীর করুণ জীবনের কাহিনী। কিষ্টো মল্লিক, শীধর মল্লিক, কানাই দিগরের আত্মহত্যার গল্প। নিশি আর চাঁপি ভক্তার শরীরগুলো কেমন করে সন্ধ্যেটি হলেই শেয়াল-শকুনের খাদ্য হয়ে ওঠে, সেটা বলতে গিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে সে। আরো বহু মেয়ের হাল হদিশ বলতে পারে না সুচাঁদ। রূপমতী, তারা, যশোদা, খাঁদি, টিয়া, পলাসী, এমনিতরো বহু কিশোরী যুবতী – যারা গত দশ বছর ধরে রঙলালের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে কাছাড়ের পথে – তারা যে কোথায় কেমন আছে, জানে না কেউ"।*[৬]

রঙলালের মতো 'আড়কাঠি'রা বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। তাদের লোভের আগুনে ঝলসে গেছে কত পরিবার, নষ্ট হয়েছে কত মেয়ের সতীত্ব। গজাশিমুল গ্রামে হতদরিদ্র বসু-শবরদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বাঁকুড়ার বাংলার অধ্যাপক রাজীব বাবু। তিনি ভালোবাসতেন লোক-সংস্কৃতিকে। প্রথম জীবনে ছিলেন সত্যিকারের একজন ফোকপ্রেমিক। ঘুরে ঘুরে ফোক সংগ্রহ করা তাঁর বিশেষ নেশা ছিল। গজাশিমুলের মানুষের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। আদিবাসী সরল মানুষগুলি সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। বসু-শবরেরা শহুরে বাবুদের 'কাঁকড়া' বলে ডেকেছে। রাজীবের পরিচয় পেয়েও তারা সহজে ধরা দিতে চায়নি। প্রত্যাখ্যাত হয়েও রাজীব হাল ছাড়েননি। বারবার উঠোনে চেপে বসেছেন, বাচ্চাদের কোলে-কাঁখে নিয়েছেন, তাদের মধ্যে লজেন্স-বিস্কুট বিলিয়েছেন, বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে মা-মাসী পাতিয়েছেন, সর্বোপরি লেখাপড়া জানা সুচাঁদ ভক্তাকে হাত করে একটু একটু করে বরফ গলাতে পেরেছেন। বসু-শবরদের অর্ন্তবৃত্তে ঢুকে পড়েছেন। সাহায্যের দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে নেমেছেন। সাঁকো নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো মসৃণ করেছেন, রঙলালের দুষ্ট চক্র থেকে বাঁচাতে সমবায় সমিতি গঠন করেছেন, প্রয়োজনে নিজে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। আসাম মুলুকে গ্রামের মানুষগুলি যে ভালো অবস্থাতে নেই সে পরিস্থিতি তুলে ধরতে সুচাঁদকে নিয়ে আসামে পাড়ি দিয়েছেন। লোকজীবনকে ভালোবেসেছেন প্রকৃত অর্থেই। ছোট্ট গ্রামটির খাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অজানা লোককথা, লোকসংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রচারের আলোয় গ্রামটিকে নিয়ে এসে এদের আর্থিক দুর্দশা ঘোচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর এমন দেবদূত হয়ে

ওঠার প্রাথমিক পর্বে গ্রামের মানুষগুলির মধ্যে কেমন যেন সন্দেহ কাজ করছিল। আসলে কোন ভদ্রলোকেরা তো তাদের প্রতি ভালো আচরণ করেনি। তাই তাঁদের জিজ্ঞাসাটিও ছিল সঙ্গত:

> *"গজাশিমুলের মানুষ অবাক হয়ে শুধিয়েছিল, 'তো ইয়াতে তুমার লাভটা কি মাস্টার? তুমি ক্যানে কালিজ কামাই করে পইড়্যে রয়েঁছো মোদ্যের মাঝে ?"*[৭]

প্রফেসর রাজীব এর উত্তরে জানিয়েছিল:

> *"গাছে মিষ্টি আমটি পেকেছে, লোকচক্ষুর আড়ালে। আমি চাই, মিষ্টি আমটি দুনিয়ার তাবত মানুষ খাক। আমার প্রথম লাভ বলতে এটাই। আমার দ্বিতীয় লাভ হল, আমি চাই-রঙলাল ক্রমশ রোগা হয়ে যাক। সে আমার পৌরুষে আঘাত দিয়েছে। আর তৃতীয় এবং শেষ কারণ হল, রাজীব মিষ্টি হেসে বলে, 'আমি চাই, তোমাদের মত সরল, অকপট দুঃখী মানুষগুলো একটুখানি সুখের স্বাদ পাক"।*[৮]

ফোকপ্রেমী রাজীবের লোকসংস্কৃতির নেশা ক্রমশ পেশাতে পরিণত হয়। উপন্যাসে ঘটনাচক্রে ক্যাথি বার্ডের আগমন ঘটে। গজাশিমুল গ্রামের লোকসংস্কৃতি দেখে তিনি মজে যান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। দেশ-বিদেশের ফোকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটানো তার কাজ। তিনি 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশন'-এর পূর্ব-ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর এবং 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করেসপন্ডেন্ট। ক্যাথি বার্ডের আগমনে রাজীবের উদ্যম আরো বেড়ে যায়। ফোক ফাউন্ডেশনের বাঁকুড়া শাখার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রাজীব বাবু। পৃথিবীর অন্ধকার প্রান্তে রাঢ় এলাকার ডাঙা-ডিহি, টাঁড়-টিকরে লুকিয়ে থাকা বসু-শবরদের সযত্নে লালিত লোকসংস্কৃতিগুলিকে বাইরে চাউর করাতে কোথাও যেন বাণিজ্যের গন্ধ ম-ম করতে থাকে। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা কয়লা বা সোনাকে চোরাকারবারিরা তুলে এনে যেভাবে আনন্দ পায় সেই আনন্দ পেতে শুরু করেছিলেন রাজীব ও ক্যাথি বার্ড। ব্যক্তিগত নাম, যশ, অর্থলাভ আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিল। বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কেউ বা কিছু মানুষ কোন জিনিসকে ব্যবহার করতে চাইছে তখনই তা বিপণনযোগ্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তি বা দলের অসাধু মনোবৃত্তিটাই বড় হয়ে ওঠে। গজাশিমুল গ্রামের ফোককে নিয়ে কমার্শিয়ালিজমের সুর আগে থেকেই আমরা পাই ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে রাজীবের কথোপকথনে :

> *"রাজীবকে ছেড়ে দেয় ক্যাথি। বাঁ-হাত দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছতে মুছতে বলে, 'হ্যাঁ, শোন, সামনের লাস্ট উইকে ফ্রি আছ তুমি ?'*
> *রাজীব একটু সময় নেয়। ঘাড় ঘুরিয়ে পাখিটাকে দেখে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়-গলা-মুখ, মুছে নেয় পরিপাটি করে। তারপর ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে পাতা ওলটাতে থাকে।*
> *বলে, 'ওরে বাবা! লাস্ট উইকে আমি অফু'লী বিজি। পরপর তিনটে কল-শো'।*
> *'পরের মাসের ফার্স্ট বা সেকেণ্ড উইকে ?'*
> *'মালদা যাচ্ছি পাঁচ তারিখে। সেখান থেকে শিলিগুড়ি....'।*
> *'আই সি -। প্রচুর কল-শো পাংচ্ছ তোমরা, তাই না ?'*
> *'প্রচুর না হলেও বেশ ভালোই পাচ্ছি'।*
> *'ব্যাপারটিকে কি কমার্শিয়াল করতে চাইছ ?'*
> *'ঠিক কমার্শিয়াল নয়। গজাশিমুলের বত্রিশটি পরিবারের নিদারুণ অভাবের কথা তো তোমায় বলেছি।... "।*[৯]

দাস-ব্যবসায়ী রঙলালের হাত থেকে বাঁচাতে রাজীবের এই উদ্যোগ সদর্থক। কিন্তু নেশা অতিরিক্ত হয়ে গেলে যেমন চেতনা থাকেনা, সচেতন দিকগুলো হারিয়ে যায়। তখন সেই নেশা সর্বনাশা হয়ে ওঠে। প্রফেসর রাজীব সত্যিকারের ভালোবেসে বসু-শবরদের লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের আর্থিক সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। যত দিন যেতে লাগল দুনিয়ার মানুষের কাছে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল,

বিশেষ করে ইস্ট ওয়েস্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত হবার পর তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেন, 'ব্লু বার্ড' প্রকাশনি থেকে মিঃ খান্ডেলওয়াল বই লেখার প্রস্তাব নিয়ে এলেন - সবেমিলে রাঢ়ের মাটির গন্ধ মুছে যেতে লাগল, তিনি একটু একটু করে রঙীন জগতে ঢুকলেন। মানভূমের অজানা সংস্কৃতিকে পত্রিকা কিম্বা বই আকারে প্রকাশ করে অর্থ ও যশ লাভের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন।

পৃথিবীর সব জিনিসই আজ বিপণনযোগ্য হয়ে উঠছে। খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, এমনকি নারী-পুরুষের গোপন বিষয়ও আজকের বিপণনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ঘর আর বাহির একই হয়ে গেছে। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের গোপন খবর, তাদের রীতিনীতি, লোকসংস্কৃতি মাউসের একটা ক্লিকেই ভেসে উঠে। কতিপয় মানুষের মুনাফা লাভের উপাদান-উপকরণ হয়ে ওঠে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলি। রাজীব ও ক্যাথি বার্ডের ক্ষেত্রে উপাদান-উপকরণ হিসাবে উঠে এসেছে বাঁকুড়ার গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবরেরা। মাটির সোঁদা গন্ধ উবে গিয়ে রঙীন ফুলের কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। প্রফেসর রাজীব নাম, যশ ও অর্থ-বৈভবের রঙীন মাদকতায় একটু একটু করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে বসু-শবরদের চিরন্তন ঐতিহ্যে আঘাত হানেন। তাদের শ্রেষ্ঠ কিন্তু গোপন সংস্কৃতি 'জলকেলি' নৃত্য প্রকাশ্যে আসে রাজীবের কুচক্রে। রাজ্য লোক-উৎসবে প্রথম হবার নেশায় তিনি এতদিনের সবার অলক্ষে লালিত 'জলকেলি' নৃত্যকে সর্বসমক্ষে নিয়ে এসে তাদের অস্তিত্বকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছেন। কানাইশরজীউকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বসু-শবরদের মেয়েরা আষাঢ় মাসের তৃতীয় পক্ষে গভীর রাত্রিতে প্রায় উলঙ্গ হয়ে জলকেলি প্রদর্শন করেন। এটি তাদের বহু প্রাচীন একটি প্রথা। পুরুষরা সেখানে থাকে না। একান্তভাবেই মেয়েদের উৎসব।

আমরা জানি যে, কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের মানুষেরা ছিলেন দৈব নির্ভর। উইন্টারনিৎসে তাঁর 'A History of Indian Literature' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, সেই সময়ের মানুষেরা সম্পদ সংরক্ষণের শক্তি, গো-ধন ও শস্য লাভ, শান্ত নীড়ের বাসনা, কৃষির সম্প্রসারণের জন্য পুত্র কামনা, কৃষি-কর্মের সহায়তা ও শত্রুদমনে দলবৃদ্ধির জন্য দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাত। অল্পে সন্তুষ্ট সদ্য প্রফুল্ল মানুষেরা মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবতার কাছে জানিয়েছে শতবর্ষ বেঁচে থাকার প্রার্থনা :

'অসুনিত পুনরস্মাসু চক্ষু:
পুন: প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃড়য়া ন: স্বস্তি'। [ঋগ্বেদ/১০ মন্ডল/৫৯ সূক্ত][১০]

'আড়কাঠি'তে রাজীব মাস্টার গজাশিমুল গাঁয়ের বসু শবরদের গোপন লোকাচারকে বাইরে এনে একটা ফাটকা বাজার করতে চেয়েছেন। লোক-সংস্কৃতি প্রদর্শনের নামে ধান্দাবাজী করেছেন। মিঃ বাজোরিয়ার সঙ্গে কথোপকথনে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে:

"বাজোরিয়া বিড় বিড় করে বলে, 'তবে আমি শুনেছিলাম আপনাদের রেট নাকি অনেক কম। চার-পাঁচ হাজারের মধ্যে। কোন্ একটা কাগজে যেন আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়েছিলাম মাস দুয়েক আগে। তাতে আপনি দলের আয়-ব্যয়ের একটা ইকোনোমিক্স দিয়েছিলেন। ওতেও আপনাদের রেট পাঁচ-ছ'হাজারের মধ্যে বলা ছিল'।
'ভুল দেখেন নি'। আধপোড়া সিগারেটখানা ছাইদানিতে গুঁজতে গুঁজতে রাজীব বলে, 'তবে সম্প্রতি আমরা রেট রিভাইজ করেছি। আট হাজার। দলের ম্যানেজারকে ঐ টাকাটাই দেবেন। বাকিটা আমাকে। আপনি তার থেকে কমিশন পাবেন। টুয়েন্টি পারসেন্ট। বুঝতেই পারছেন ঐ বাইশ হাজারের কোনও রসিদ পাবেন না"।[১১]

সভ্যতার এই সমস্ত দালালদের কাছে লোক-সংস্কৃতি কেবল ফুর্তির হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিসম্পন্ন গজাশিমুলের বসু-শবরদেরকে নিয়ে জঘন্য ব্যবসায় নামলেন রাজীব। কানাইশরজীউকে সন্তুষ্ট করার পবিত্র নৃত্যকলা 'জলকেলি' দূষিত হয়ে উঠল। নৃত্যপরায়ণা চঞ্চলা রঙী হয়ে উঠল 'ডবকা ছুঁড়ি'। বাজেট নিয়ে দরকষাকষিতে রাজীব বলেছেন :

> *'তার মধ্যে একটা ডবকা ছুঁড়ি আছে, দেখেছেন তো ? ওকে দেখলে আপনার বড়বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে মশাই। ওর এক-একখানা বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে'।*[১২]

এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে? গরীব মানুষের সরল বিশ্বাসকে চরম অপমান করলেন রাজীব বাবু। রাজীব মাস্টারের এক নম্বরের ভক্ত সুচাঁদ ভক্তার মনে জন্ম নেয় সুতীব্র ঘৃণা। গরীব মানুষের কাছে নারীর ইজ্জতটাই বড় ব্যাপার। সুচাঁদ ভক্তা গলায় তীব্র ঘৃণা ও দ্বেষ ফুটিয়ে বলে :

> *'মাস্টারদা, তুমি টাকা-পয়সা লিয়ে যা কচ্ছিলে কচ্ছিলে। কিন্তু সুনীলদা যেদিন বইলল্যাক, রঙীর উদোম শরীরের ফোটো খুলা-বাজারে বিক্‌কিরি হচ্ছে বিদেশে -'।*[১৩]

রঙলাল যা শুরু করেছিল রাজীব মাস্টার তাতে কফিনের শেষ পেরেকটা পুঁতে দিলেন। দেশের নিষিদ্ধ পল্লীতে বসু-শবরদের অনেক মেয়েকে বেশ্যা হতে বাধ্য করেছে রঙলাল। রাজীব মাস্টারের বদান্যতায় রঙী আন্তর্জাতিক বেশ্যাতে পরিণত হল। লোক-সংস্কৃতিকে জগতের সামনে তুলে ধরার নেশা কিভাবে রঙীন মাদকতার জন্ম দিয়েছে, কিভাবে একটি অন্ত্যজ জনজাতির জীবনে ঘনিয়ে এল চরম সংকট, ফোকপ্রেমীটিও কিভাবে কলুষিত হল তার অনবদ্য আখ্যান হল ভগীরথ মিশ্রের "আড়কাঠি" উপন্যাস।

তথ্যসূত্র :

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* ১৯৩৮, পৃ. ১৩।
২. ভগীরথ মিশ্র, *ঐন্দ্রজালিক*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১০।
৩. *মহারাষ্ট্রপুরাণ,* সম্পা. হারাধন দত্ত, ১৯৬৭, পৃ.১৮-২৩।
৪. ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. জানুয়ারি ২০০৮, পৃ.২৩।
৫. তদেব, পৃ. ৩৫ ।
৬. তদেব, পৃ.৭০ ।
৭. তদেব, পৃ.৭৩ ।
৮. তদেব, পৃ.৫৫ ।
৯. তদেব, পৃ.৫৪ ।
১০. তাপস বসু, *বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য,* ১ বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৩।
১১. তদেব, পৃ.১৫৭ ।
১২. তদেব, পৃ.১৫৮ ।
১৩. তদেব, পৃ.১৫৯ ।